ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1046-1051
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.103

ভারতীয় সাহিত্যে নদীমাতৃক পুরাণ ও আধুনিক বয়ান

ড. সমরেশ মন্ডল, *স্বাধীন গবেষক, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 19.03.2025; Accepted: 20.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Abstract

I have primarily focused on river-centric Bengali novels in this article. While the subject falls under Indian literature, I have incorporated the context of Bangladeshi novels not merely to reinforce my argument but to illustrate how people's perspectives evolve over time. My discussion spans work such as Manik Bandopadhyay's Padma Nadir Majhi, Debesh Roy's Tistaparer Brittant, Samaresh Basu's Ganga, Humayun Kabir's Nadi o Nari, and Advaita Mallavarman's Titas Ekti Nadir Naam. Through these novels, I have explored how river-centric narratives emerge from folk beliefs and myths, gradually transitioning toward new interpretations and evolving ideologies. This article aims to analyse that transformation, emphasising the dynamic interplay between tradition and changing perspectives.

***Keywords**: Myth–Puran, Believe, Tradition, Narrative technique, Folk-culture.*

প্রাচীনকালে রচিত সাহিত্য থেকে শুরু করে এ সময়কালের সাহিত্যেও নদী অপরিহার্য বিষয়। গীত, কবিতা, উপন্যাসসহ সাহিত্যের সব শাখাতেই নদী যুক্ত হয়েছে কখনো প্রধান ভূমিকায়, কখনো বিষয়বস্তুর প্রয়োজনে । এটি শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, বিদেশি সাহিত্যেও নদী গুরুত্বপূর্ণ অনুষঙ্গ । মানুষের জীবনযাপন, সভ্যতার বিকাশ ও ঐশ্বর্যনির্মাণ, ইতিহাস, আন্দোলন-সংগ্রাম-সবকিছুতেই নদী দৃঢ়তর ভূমিকা পালন করে । মানুষের জীবনে নদী কখনো বন্ধু, কখনো ভয়ঙ্কর প্রতিপক্ষ ও ধ্বংসকারী । নদীকে এড়িয়ে মানুষের জীবন গড়া ও সভ্যতার ঐশ্বর্য নির্মাণ অকল্পনীয়। নদীভিত্তিক আঞ্চলিক বিভিন্ন উপন্যাসে এ সত্য নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে । নদী ও মানুষ একে-অপরের সম্পূরক। উপন্যাসে এ সত্যতা ধরা পড়েছে বিভিন্ন রূপে । কোনো বাঙালি উপন্যাস লিখেছেন কিন্তু নদীকে স্পর্শ করেননি এমন দৃষ্টান্ত বিরল । যদিও সাহিত্যের প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা সাহিত্যে নদী একটি অপরিহার্য বিষয় হয়ে আছে। সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখাতে তার গুরুত্বপূর্ণ উপস্থিতি বা ভূমিকা স্পষ্ট ।

নদীবিহীন জীবন যেমন বাঙালির কাছে অকল্পনীয়, সাহিত্যেও নদীর ভূমিকা যেন একই সত্য ধারণ করে । ‘চর্যাপদ’, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য’, ‘মহাভারত’, ‘মনসামঙ্গল কাব্য’, ‘চণ্ডীমণ্ডল কাব্য’, ‘অন্নদামঙ্গল কাব্য’, ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’, ‘মেঘনাদবধ কাব্য’, ‘ব্রজাঙ্গনা’, ‘চতুর্দশপদী’ কবিতা প্রভৃতি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ সব সাহিত্যে নদী এসেছে নানাভাবে, বিচিত্র রূপে । পরবর্তীতে উপন্যাসের যাত্রা শুরু হলে সেখানে নদী এসেছে অপরিহার্যতার অংশ হিসেবে। কখনো নদীকে ঘিরেই উপন্যাস নির্মিত হয়েছে । আবার নদীকে ঘিরে পুরো উপন্যাস নির্মিত না হলেও উপন্যাস বা উপন্যাসের জীবনের প্রয়োজনে নদী এক প্রধান শক্তি হয়ে উঠেছে । হিন্দু ধর্মে নদী থেকে শুরু করে পর্বত, গাছ, পশু, বিদ্যুৎ, বাতাসকে সম্মান জানানো হয় । এর অর্থ হিন্দুধর্মে প্রকৃতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় । তালিকায় আসে নদীও। নদীর প্রকৃতিক গুরুত্ব অপরিহার্য । ভারতীয় সংস্কৃতিতে, নদীকে দেবী হিসেবে পূজা করা হয় । যেমন, আমরা

গঙ্গা থেকে সরস্বতী প্রত্যেক নদীকেই দেবীরূপে পূজা করি । তাই গবেষণা পত্র আলোচনায় পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬), গঙ্গা (১৯৫৭) এবং তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (১৯৮৮) এই চারটি উপন্যাস রয়েছে। এই উপন্যাসগুলি নদীকেন্দ্রিক বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যের । প্রথম তিনটি উপন্যাস মোটামুটিভাবেই সময়ের পরিসর একই থাকায় ফলে এবং তিস্তাপারের বৃত্তান্ত উপন্যাস সময়ের তারতম্য একটু বেশি থাকার ফলে উপন্যাসগুলিকে পাশাপাশি রেখে আলোচনা করতে সুবিধা হয়েছে , সেজন্য এই উপন্যাসগুলিকে নির্বাচিত করেছি।

মানব সভ্যতার আদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপটি নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। তাই সিন্ধুনদের অববাহিকায় সিন্ধুসভ্যতা, নীলনদের অববাহিকায় প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর আববাহিকায় গড়ে উঠেছে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় সভ্যতা। মানুষ সেখানে ঘর বেঁধেছে, চাষ করেছে, করেছে সংসার জীবন। বিভিন্ন নদ নদী ঘেরা বাংলার সামাজ সংস্কৃতিতে তাই নদীকেন্দ্রিকতার গুরুত্ব অনেক বেশি। বাঙালির কাব্যে, গানে, গল্পগাথায় সাহিত্য জীবনের ওঠা নামার নিত্য পরিবর্তনের মধ্যে নদীর জীবনকথা নানাভাবে জড়িয়ে রয়েছে। 'নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস' এই কথাটির মধ্যেই স্পষ্ট যে এই শ্রেণির উপন্যাসের মূল কেন্দ্রচারিণী শক্তি হল নদী। তাই মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, দারিদ্র্য-সংগ্রাম, যন্ত্রণা সবই এখানে নদীকে ঘিরে আবর্তিত। নদীকেন্দ্রিক উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে প্রধানত দাঁড়িয়ে আছে বৃত্তিজীবী শ্রেণির জীবনচিত্র একটা বিশেষ অঞ্চলের ভূগোল, বিশ্বাস, আচার-আচরণ মেখে এই শ্রেণির উপন্যাস গড়ে উঠলেও নিছক আঞ্চলিক বর্ণলেপ দিয়ে বিচার করা সঙ্গত নয়। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত ধীবর সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য-সংগ্রাম যন্ত্রণা শোষণ নির্যাতনের ছবি এসব উপন্যাসে আছে তা কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত বিশ্বাস প্রচলিত রয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল নদীকে তারা অতীতে দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই নদীকেন্দ্রিক এই বিশ্বাস বিবর্তিত হয় তার প্রধান কারণ হল সমাজ ও অর্থনীতির পালাবদল। মানুষের জীবন ও জীবিকার সহায়ক ভূমিকা হিসেবে নদী একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হয়ে ওঠে। ফলত নদী সম্পর্কিত পুরানো ধ্যানধারণা লক্ষ করা যায়। এই বিবর্তন একরৈখিক নয়, বিভিন্ন নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বিভিন্ন মিথের বহুরৈখিক রূপান্তর লক্ষ করা যায়। তা আসলে ঐ নির্দিষ্ট অঞ্চলের স্থানিক পটভূমির উপর বিন্যস্ত। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত মানুষের জীবনযাত্রা তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম রসদই হল নদী। উপার্জনের মাধ্যমে তারা বেঁচে থাকতো । সেইজন্য নদীকে তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করতো। তখনই তারা সমষ্টিগত জীবনযাপন করতো। নদী তাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা এই বিশ্বাসের ভাঙন ধরে সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। তাদের বিশ্বাসটাই মিথে পরিণত হয়েছে। নদী যেমন এককুল ভাঙে আর এককুল গড়ে ঠিক তেমনিভাবে মিথের ভাঙাগড়ার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। মিথ অতীত থেকেই চলে আসছে, ইতিহাসের মতো মিথও কখনো নির্দিষ্ট গন্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চায় না।

অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' বাংলা সাহিত্যে একটি অন্যতম উপন্যাস। উপন্যাসটি চারটি খন্ডে বিভক্ত যেখানে নদীর বর্ননা, বৈচিত্র্য ও মানবজীবনের সম্পৃক্ততা অতি সহজেই চোখে পড়ে। উপন্যাসের শুরুতে লেখক জানান –

"এ নদীর কুলজোড়া জল, বুকভরা ঢেউ আর প্রাণভরা উচ্ছাস।"[১]

তিতাসের তীরে ধীবর সম্প্রদায়ের সুখ-দুঃখ, সাফল্য ব্যর্থতা ভরা জীবনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। এই ইতিহাস তাদের যুগ যুগান্তর গাঁথা রয়েছে বেঁচে থাকার লড়াইয়ে। তিতাসকে নিয়ে তাদের বিশ্বাস, লোককথা, সংস্কৃতি সবই গড়ে উঠেছে। যখনই তাদের মধ্যে তিতাসকে নিয়ে বিশ্বাস জন্মায় তখনই তারা সংঘবদ্ধ জীবনযাপন করে। তিতাসের জল শুকিয়ে যায় এই কথা তারা কখনো বিশ্বাস করতে পারেনি। এই বিশ্বাস তাদের জীবনে মিথ প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজ ও অর্থনীতি পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বিশ্বাসের জগতে ভাঙন শুরু হয়। যখনই তাদের মধ্যে বিশ্বাস জন্মায় তখনই তারা সবকিছু করতো যেমন গুরুজনদের মানতো, পূজাপার্বণ উৎসব আনন্দ করতো । এখন তাদের মধ্যে ভাটার টান ধরেছে। মালোরা এখন উল্টোটাই করে যেমন ঘাটে নৌকা ভিড়বার সময় কে আগে ভিড়বে এই নিয়ে মারামারি করে অথচ অতীতে দেখা গেছে সমষ্টিগত জীবনযাপন করতো এখন তারা ব্যক্তি জীবনে চলে আসছে। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে তারা বুঝতে পারছে এবং সময়ও তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে তিতাসের জলও শুকিয়ে গিয়ে মাঝ বরাবর সরু জলরেখা প্রবাহিত হয়েছে। এই পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপটে অনুযায়ী। অর্থাৎ সময় কখনো নির্দিষ্ট জায়গায় না থেমে ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। লক্ষণীয় জেলেদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে এই

উপন্যাসের এক একটি আখ্যান। প্রত্যেকে কথা বলার মধ্যে দিয়ে গল্পের কাঠামো তৈরি হয়েছে যেমন আরব্যরজনী, ডেকামেরনে আমরা এটা দেখতে পাই। পুরানো বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসে তারা নতুন বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে যেখানে গেলে বেঁচে থাকার অধিকার পায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলে জেলেদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, সাফল্য ব্যর্থতা ভরা জীবনের ইতিহাস রচনা করেছেন। এই ইতিহাস যুগ যুগান্তর গাঁথা রয়েছে তাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ে। উপন্যাসে মানিক নদীর গুরুত্ব, প্রাধান্য, প্রভাব নিছকই প্রকৃতিগতভাবে দেখেননি, দেখেছেন বাস্তব হিসেবে। উপন্যাসে কুবের, কপিলা, ধনঞ্জয়, হোসেন মিয়া, মালা ইত্যাদি এদের জীবন পদ্মাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। উপন্যাসে গোষ্ঠীজীবন ও ব্যক্তিজীবন বর্ণিত হলেও সমস্ত চরিত্রই নদীলিপ্ত। ধীবরদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, জন্মমৃত্যু সম্পর্কের টানাপোড়েন এই বিচিত্র বিন্যাসের মধ্যেও এক ধরনের প্রতীতি জন্মেছিল যে পদ্মাই তাদের প্রাণকেন্দ্র। জেলেদের জীবন অতি কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত হলেও তাদের ঘরে দেবদেবীর আরাধনা কোনোদিন বন্ধ হয়ে যায় না। কুবের, কপিলা, আনিমুদ্দিন এরাও পদ্মার সন্তান, পদ্মাকে নিয়ে জেলেদের ভালোবাসা জন্মেছে। তাই কুবেরের কথায়–

"দিন কাটিয়া যায়। জীবন অতিবাহিত হয়। ঋতুচক্রে সময় পাক খায়...।"[২]

পদ্মার জীবনে নিজের জালনৌকা না থাকায় মাশুল দিতে হয় তাদের। তাই লেখকের কথায় –

"টাকার অভাবে অখিল সাহার পুকুরটা এবারও সে জমা লইতে পারে নাই।
সারাটা বছর তাকে পদ্মার মাছের উপর নির্ভর থাকিতে হইবে...।"[৩]

সেই বিশ্বাস, সেই ভালোবাসা তাদের জীবনে মিথ প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পদ্মার তীরবর্তী অঞ্চলে বন্যা প্লাবিত হয়ে জেলেদের ঘরবাড়ি ভেসে যায় তখন তারা আর পদ্মাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। তাদের বিশ্বাসের ভাঙন শুরু হয়। সময় কখনো নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে নেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কিছুই পরিবর্তিত হতে থাকে। এমনকি তারা গোষ্ঠীজীবন থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিজীবনে চলে আসছে। প্রত্যেকে নিজের নিজের কথা ভাবছে যেখানে গেলে তারা বেঁচে থাকার অধিকার পায়। আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে তারা বুঝতে পারছে এবং সময় ও তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, পদ্মাও আজ পরিবর্তিত। পদ্মার তীরে যেভাবে মাটির ভাঙন দেখা যায় ঠিক তেমনিভাবে ভাঙন ধরে তাদের সম্পর্কের বন্ধনে। সেই বিশ্বাস, সেই ভালোবাসা পদ্মাতেই বিসর্জন দিয়ে ছুটে যায় অনিবার্য এক নতুন মান অন্বেষণে।

'নদী ও নারী' উপন্যাস পদ্মাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ধীবরদের সুখদুঃখের ইতিহাস রচিত হয়েছে। নদীই ছিল তাদের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম রসদ। পদ্মাতে যখন উপার্জন বেশি হয় তখন তাদের মুখে হাসি ফোটে, আনন্দের ছাপ ভাসতে দেখা যায়। সেইজন্য নদীকে তারা মাতৃরূপে দেখেই এসেছে এবং নদীই তাদের একমাত্র রক্ষাকর্তা। যতক্ষণ নদীতে মাছ ধরে ততক্ষণ সংসার চলে। একদিন যদি তারা মাছ ধরতে না যায় সংসার চলে না, এমনকি সংসারে টানাপোড়েনও শুরু হয়ে যায়। তাই যতই ওদের কষ্ট হোক নদীতে মাছ ধরতে যাবেই, এছাড়া তাদের কোনো উপায় নেই। সেইজন্য নদীকে নিয়ে তাদের একধরণের বিশ্বাস জন্মায় বিশ্বাসটাই মিথে পরিণত হয়েছে। নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ঢেউ উপছে পড়ে তাদের ঘরবাড়ি ভেসে যায়। পদ্মাতে মাছ ধরতে গিয়ে মালেকের বাবা আর ফিরে আসে না এবং নৌকাও অতল তলে তলিয়ে যায়। তখনই তাদের বিশ্বাসের ভাঙন শুরু হয়। আধুনিককালে তারা বুঝতে পারছে এবং সময়ও তাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পদ্মাও পরিবর্তনের রূপে সজ্জিত হচ্ছে। সেইজন্য ধীবররা অন্য বিশ্বাসের সন্ধানে মগ্ন হচ্ছে। তারা সংঘবদ্ধজীবন থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিজীবনে প্রতোকে নিজের নিজের কথা ভাবছে, তারা বঝতে পারছে নদী যেমন রক্ষক তেমনিভাবে ভক্ষকও। উপন্যাস নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে এক একটা আখ্যান।

১৯৮৮ সালে প্রকাশিত দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' বাংলা সাহিত্যে একটি অন্যতম উপন্যাস। তিস্তানদীর তীরবর্তী দরিদর্য্ বাসিন্দাদের সুখদুঃখের কাহিনি রচনা করেছেন লেখক। ধীবরদের জীবনে সুখের থেকে দুঃখটাই অন্যতম মাত্রা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ধীবররা প্রতিকুল পরিবেশের মধ্যে বাস করে জীবিকা নির্বাহ করেই বেঁচে থাকছে। যতদিন তারা নদীর উপর নির্ভর করে থাকতো ততদিন তারা নদীকে মাতৃরূপেই দেখত। এরই ফলে নদীকে নিয়ে

ভালোবাসা ও বিশ্বাস জন্মেছে। কিন্তু এই ভালোবাসা, বিশ্বাস কখনো স্থায়ী নয়, সময় ও স্থানের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবনেও পরিবর্তনের আকার ধারণ করে । এই পরিবর্তন কখনো একরৈখিকভাবে নয় বিভিন্ন নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা বহুরৈখিক রূপান্তর লক্ষ করা যায় । নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অসহায় মানুষদের মধ্যে রাজনীতি নেতা গজিয়ে উঠে সুযোগ নিচ্ছে অথচ তাদের দুঃখ যন্ত্রনার কথা কেউ বুঝছে না। তিস্তা নদীর উপর জোর করে ব্যারেজ করে মানুষ নিজের সুবিধার্থে ব্যবহার করছে। আধুনিককালে দাঁড়িয়ে মানুষের চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটছে। অতীতে নদীকে যেভাবে দেখা হতো এখন আর নদীকে মানুষ সেইভাবে দেখছে না। স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হচ্ছে।

সমরেশ বসু 'গঙ্গা' উপন্যাসে গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে মাছধরা ধীবরদের জীবনের অনিশ্চয়তার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছেন। মাছমারা ধীবরদের জীবনসংগ্রামের রূঢ় বাস্তবস্তার দিকটি সমরেশ বসুর হাতে আরো ব্যাপক ও গভীর। হিমি, বিলাস, পাঁচু, নিবারণ এদের জীবন নদীকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। এদের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, সাফল্য ব্যর্থতা ভরা জীবনের ইতিহাস রচিত হয়েছে গঙ্গাকে কেন্দ্র করেই। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত মানুষদের জীবন, তারা নদী ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না। নদীই বেঁচে থাকার একমাত্র রসদ। লেখক শুরুতেই জানিয়েছেন যে পুরোখৌড়গাছি, ধলতিতা, তেঁতুলিয়া, সারাপুল, ফতুন্নোপুর, ফরিদকাঠি, বীরপুর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জেলে, কৈবর্ত, মালো এমনকি রাজবাংশীরাও মাছ ধরতে ছুটে আসে। কেননা সব মৎসজীবিদের ভাত কাপড় নদীর কাছে বাঁধা। তাই নদীকে তারা দেবীরূপে পূজা করে। নদীকেন্দ্রিক যে সমস্ত মানুষদের জীবন তারা প্রতিবছরই গঙ্গা দেবীকে পূজার্চনা করে । তাই গঙ্গাকে কেন্দ্র করে ভালোবাসা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি সবই গড়ে উঠেছে। সেই বিশ্বাস, ভালোবাসা তাদের জীবনে মিথ প্রতিমা হয়ে দাঁড়িয়েছে । এই বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে । বিলাস যদি 'গঙ্গা' উপন্যাসের মূল শক্তি, তবে তার উপযুক্ত পরিপূরণ হিমি। উপন্যাসে বিলাস-হিমির প্রেমের পটভূমি রচনাতেও গঙ্গা নদী এক তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে । নিবারণের মৃত্যু এই উপন্যাসে একটি গুরুত্বপুর্ণ ঘটনা । যদিও মূল পর্বে তা ঘটেনি । তবুও নদীকে নিয়ে যাদের বিশ্বাস ছিল তাদের জগতে ভাঙন শুরু হয় । নদীর বুকে মৃত্যু ঘটল একদিন পাঁচুর, বলে গেল হিমির সঙ্গে মেলামেশা তার কোনো আপত্তি নেই। উপন্যাসটি শেষ হয় এইভাবে –

> "ঢেউ লেগেছে রাইমঙ্গলে আর ঝিল্লের মোহনায়। কালীনগঞ্জ থেকে চাল ডাল নুন তেল জোগাড় যন্ত্র হয়েছে। সাঁইদারের অপেক্ষা।
> সাঁইদার কে?
> বিলেস। তেঁতলে বিলেস।
> তেঁতলে বিলেস সমুদ্রে যায়।"[৪]

সময় কখনো নির্দিষ্ট জায়গায় থেকে নেই, সময়ের সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত কিছু পরিবর্তিত হতে থাকে। তারাও অন্য বিশ্বাসের সন্ধানে মগ্ন হচ্ছে যেখানে গেলে তারা বেঁচে থাকার আশ্রয় পায়।

'তিতাস একটি নদীর নাম', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'গঙ্গা' এবং 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' এই চারটি উপন্যাসের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাভাবনা কীভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে । তুলনামূলক সাহিত্যে প্রসঙ্গতত্ত্বের (Thematology) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, 'নদী' একটা বিষয় অনেক বড় পরিস্থিতিকে বোঝাচ্ছে । 'নদী' বিষয়কে ঠিক রেখে বিভিন্ন লোক স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখছে। যেমন অতীতে বা পুরাণে নদীকে দেবতা, মাতৃজ্ঞানে পূজা করতো এবং এর জলকেও পবিত্র হিসেবে বিবেচনা করতো। আধুনিককালে বা বর্তমান সময়ে মানুষ নদীর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে বেঁচে থাকছে। অন্যদিকে আর একশ্রেণির মানুষ বিশেষ করে যারা ধনী সম্প্রদায়নি তারা নদীকে সড়কপথ, বাণিজ্যপথ হিসেবে ব্যবহার করছে যেমন গঙ্গা, হুগলি, যমুনা নদী ইত্যাদি। ইতিহাসবিদ্যার (Historiography) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নদীকে অতীতে বা পুরাণে মানুষেরা দেবীরূপে দেখে এসেছে এটা যুগ যুগ ধরে ইসিহাসের প্রেক্ষাপটে তৈরি। সময়ের মতো ইসিহাসও নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে না থেকে ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে । নদীকে নিয়ে যে বিশ্বাস মানুষের জন্মেছে সেই বিশ্বাসের পরিবর্তন হতে থাকায় মিথ বিশ্বাসেরও পরিবর্তন ঘটছে। উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় যে, প্রত্যেকে কথা বলার মধ্যে দিয়ে আখ্যান কৌশল তৈরী হচ্ছে। কথা বলার মধ্যে দিয়ে গল্পের কাঠামো তৈরি হচ্ছে যেমন আরব্যরজনী, ডেকামেরন

ইত্যাদিতে লক্ষ করা যায়। তুলনামুলক সাহিত্যে বর্গতাত্ত্বিকের (Genology) ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষদের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছে এই উপন্যাসের এক একটা বর্গ। এই বর্গও পরিবর্তনশীল। প্রসঙ্গত ভাবে বাখতিনের সাংলাপিক কল্পনা বা ডায়ালজিক ইমাজিনেশনের কথাই বলা যেতে পারে। মানুষে মানুষে কিভাবে আদান প্রদান হয়, একজন মানুষ বা মানবগোষ্ঠী কীভাবে নিজেদের ভাবনা, বেদনা, আবেগ জানাতে পারে তারই তত্ত্ব এই সংলাপবাদ বা ডায়ালোজিজম । বর্গের গোটা প্রক্রিয়া ইতিহাসের ধারণার সঙ্গে মিল রয়েছে । তাহলে দেখা যায় যে, ইসিহাসবিদ্যা, বর্গতত্ত্ব ও প্রসঙ্গতত্ত্ব ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী। প্রসঙ্গতভাবে বাখতনের পলিফোনি তত্ত্বের কথা বলা যেতে পারে। পলি অর্থাৎ বহু, ফোনি শব্দের অর্থ ধুনি বা স্বর অর্থাৎ বহুস্বরসঙ্গতিমূলক শিল্প। উপন্যাসগুলিতে দেখা যায় যে, প্রতিটি চরিত্রই বহু স্বাধীন এবং অমিশ্রিত কণ্ঠস্বরের সমাহার ঘটে এবং প্রতিটি কণ্ঠস্বরই উপন্যাসের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অংশ। বহুস্বরসঙ্গতিমূলক উপন্যাসে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সংলাপ বা কথোপকথন। এ প্রসঙ্গে বাখতিনের কার্নিভালাইজেশন ধারনার কথা বলা যায়। কার্নিভাল হল এমন এক উৎসব যা পবিত্র-অপবিত্র, বিশিষ্ট-তুচ্ছ জ্ঞানী মুর্খ সবাই একত্রিত, ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত করে গড়ে তোলে জনসাধারণের যৌথ ক্রিয়াকলাপ। জীবনের সুতীব্র প্রকাশই হল কার্নিভালের জীবন। অর্থাৎ উপন্যাসে জনসাধারণের মধ্যে সবরকমের দূরত্ব লুপ্ত হয়ে যায়, তাদের মধ্যে স্বাধীন, অবাধ ও অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কার্নিভালের জগৎ তাই মুক্ত জগৎ যেখানে কোনো রাষ্ট্র, সমাজ বা ধর্ম তাকে ভয় এবং সেই সূত্রে মানুষকেও দমন করে না রাখে, এখানে মানুষ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে নিজেদের ভাবনা, বেদনা, সুখ-দুঃখ ইত্যাদির কথা জানাচ্ছে। প্রসঙ্গত দেরিদার "Structure, Sign and Play" গ্রন্থই বলা যেতে পারে। তিনি বলবার চেষ্টা করেছেন যে, সেস্যুরের ক্ষেত্রে যে স্ট্রাকচার আছে সেটাকে যদি ভাঙি তাহলে হবে ডিকনস্ট্রাকশন অর্থাৎ যারা কেন্দ্রে ছিল তারা প্রান্তে চলে আসবে আর যারা প্রান্তে ছিল, কেন্দ্রে চলে আসবে। যেহেতু Signified নির্দিষ্ট নয়। কেন্দ্র ও প্রান্তের ঘটনা অনবরত ঘটতেই থাকবে, এটা শেষহীন এর কোনো শেষ নেই। দেরিদা বলবার চেষ্টা করেছেন, আসলে এটা একটা খেলা। অতএব ফাইনাল বা নির্দিষ্ট বলে কিছুই হয় না। সুতরাং দেখা যায় যে নদীকে অতীতে বা পুরাণে যেভাবে দেখে আসত কিংবা এর জলকে হিসেবে বিবেচনা করতো। এটা কখনো স্থিতিশীল নয় বা শেষ কথা নয়। আধুনিক বা বর্তমানে স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী কিংবা যুগের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চিন্তাভাবনা ক্রমশ পরিবর্তন ঘটছে। তাহলে বলতে পারি, পৃথিবীতে কোনো কিছুই নির্দিষ্ট নয়। তাই নদীকে আমরা দুভাবে দেখি --

১। নদী যে অঞ্চলের উপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সেখানে ঢেউ উপছে পড়ছে।

২। নদীর মাধ্যমে মানুষ জীবিকা নির্বাহ করেই বেঁচে থাকছে।

তাছাড়া নদী প্রধান সড়কপথ- যোগাযোগের সেতুবন্ধন। সুতরাং সব মিলিয়ে নদী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন আমরা দেখেছি মনসামঙ্গল কাব্যে চাঁদ সওদাগর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে। মানুষের মধ্যে ব্যক্তি ও সমষ্টি জীবন পরিলক্ষিত হয়। জনজীবনের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ইত্যাদি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। পৃথিবীতে সমস্ত কিছুই পরিবর্তনশীল স্থান ও সময়ের প্রেক্ষাপট অনুযায়ী। আবার ইংরেজি সাহিত্যে J. M. Synge 'Riders to the Sea' নাটকে সমুদ্র উপকূলে আরানদ্বীপ বাসীদের সমুদ্র নির্ভরতা। নদী একই সঙ্গে উপার্জন হলেও কখনো কখনো তার অভিশাপও রয়েছে যেমন তিস্তাপারের বৃত্তান্ত, Riders to the Sea নাটকে দেখা যায় বাড়ির পুরুষেরা সমুদ্রে গিয়ে তারা আর ফিরলো না, তারা বুঝতে পারছে জলপথ তাদের যেমন রক্ষক ঠিক তেমনিভাবে ভক্ষকও। নদীর উপকূলবাসীদের কাছে মাতৃসত্ত্বা অপরিবর্তিত সেটা আজও রয়েছে।

বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে নদীর বিষয়টি নানাভাবেই অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণে নদী প্রতিটি মানুষের সঙ্গে সম্পৃক্ত। মানুষের জীবনযাপন, সভ্যতা, ইতিহাস, আন্দোলন-সংগ্রাম-সবকিছুতেই নদী দৃঢ়তর ভূমিকা পালন করে। মানুষের জীবনে নদী কখনো বন্ধু, কখনো ভয়ংকর প্রতিপক্ষ ও ধ্বংসকারী। আবার কখনো নদী দেবীরূপে পূজিত হন । নদীকে এড়িয়ে মানুষের জীবন গড়া ও সভ্যতার ঐশ্বর্য নির্মাণ অকল্পনীয়। নদীভিত্তিক আঞ্চলিক বিভিন্ন উপন্যাসে এ সত্য নানাভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। শিল্পে প্রকরণ-বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পাঠ যাচাই করা যায়। নদী-বিষয়ী ঔপন্যাসিকরা কেমন রচনাকার, তার স্বাতন্ত্র্য কি, বিষয় নির্বাচনে তার যৌক্তিকতার ইঙ্গিত কোন ধরনের এ প্রশ্নগুলোতে সরল ভাষ্যে হয়তো যে কোনও লেখককেই চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু লেখক বিশেষত এখানকার আলোচ্য বিষয়ক

উপস্থাপনে দেবদেবীরূপে , চর-নদী-অঞ্চল জীবনাগ্রহজ্জতার নির্মাণ-প্রক্রিয়া, সংহার মূর্তির শৈলী ভাষা-শিল্প হওয়ার প্রক্রিয়ায় পদ্ধতির ব্যবহার কিংবা আবহ রচনার সৃষ্টি-কৌশলে সামগ্রিকভাকে প্রয়োজনীয় দিকসঞ্চারী-যা উপরিউক্ত আলোচনায় উঠে এসেছে।

তথ্য সূত্র

১. চট্টোপাধ্যায়, হীরেন, *তিতাস একটি নদীর নাম: উপন্যাসেরও*, কলকাতা : বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ১৪০৭, মুদ্রণ। পৃ: ৫১
২. ঘোষ, শুভঙ্কর, *শতবর্ষে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়* , মুখাবয়ব সংকলন গ্রন্থমালা, ২০১২, মুদ্রণ, পৃঃ ১৮৬
৩. তদেব, পৃ: ১৯১
৪. বসু, সমরেশ, *গঙ্গা* , কলকাতা: মৌসুমী প্রকাশনী, ২০১১, মুদ্রণ। পৃঃ ৫০

সহায়ক গ্রন্থ

১. কবীর, হুমায়ুন, *নদী ও নারী* , কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ২০০৯, মুদ্রণ।
২. দাসগুপ্ত, রাহুল, *উপন্যাসের মহাবিশ্ব* , কলকাতা: দিশা সাহিত্য, ২০১০, মুদ্রণ।
৩. রায়, দেবেশ, *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* , কলকাতা: দেজ পাবলিসিং, ২০০৯, মুদ্রণ।
৪. Bakhtin, Mikhail Mikhailovich. *Dialogic Imagination*. United States: Universe of Texas Press. 1981, Print.
৫. Derrida , Jacques. *Structure, Sign and Play* . Paris : Oxford University Press. 1966, Print.